।নি।ব।ন্ধ।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডা সম্প্রদায়ের চালচিত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ২০টি ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। সমাজে এরা অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, লোকাচার, ভাষা ইত্যাদি রয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে আদিবাসী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। এমনি একটি আদিবাসী সম্প্রদায় হলো মুন্ডা সম্প্রদায়। বাংলাদেশে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো মুন্ডা সম্প্রদায়, অপরটি মাহাতো মুন্ডা সম্প্রদায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবনের গাঁ ঘেষে এদের বসবাস। সমাজের অবহেলিত, দলিত, নিপীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এরা অন্যতম। দক্ষিণাঞ্চল ঘুরে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন মল্লিক সুধাংশু

বাংলাদেশে মুন্ডাদের ইতিহাস

বাংলাদেশে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ আদিবাসী। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমাজে বুনো, কুলি, সাঁওতাল, সরদার হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশে কবে, কখন এই মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস শুরু হলো তার কোনো সঠিক তথ্য কারো জানা নেই। তবে বাংলাদেশে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন নিয়ে নানা মত রয়েছে। যতদূর জানা যায়, মুন্ডাদের ভারতের রাচি, বাকুরা, বীরভূম, পুরুলিয়া, নাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, মেদিনিপুর জেলা থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। কারো কারো মতে, প্রথমত বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জের নলডাঙ্গার রাজারা ইংরেজ শাসনামলের আগেই মুন্ডাদের নিয়ে আসেন। তারা মুলত রাজার বাড়িতে লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করতো। দ্বিতীয়ত, ১৮৫০ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহে ছত্রভঙ্গ হবার পর ইংরেজরা নীলকুঠিতে নীল চাষের কাজে লাগানোর জন্য এদের নিয়ে আসে। তৃতীয়ত, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সুন্দরবনের লাট ইজারা গ্রহণকারী অনেক জমিদার জঙ্গল কেটে বসতিযোগ্য জমি গড়ে তোলা এবং বাঁধ দিয়ে লবণ জল ঠেকানোর জন্য মুন্ডাদের ওই সব এলাকা থেকে নিয়ে আসেন। মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের এ দেশে আসার ইতিহাস হিসেবে তৃতীয় মতটিই বেশি সমর্থন ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিজ্ঞ মহলের অভিমত।

সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচিতি

মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজে নানাভাবে পরিচিত। বুনো, সাঁওতাল, মহাতো, কুলি সরদার হিসেবেও সমাজে তাদের পরিচয় রয়েছে। তবে পরিচয় যাই থাক না কেন, এদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ভাষা রয়েছে। এদের আচার-অনুষ্ঠানে রয়েছে স্বকীয়তা। এদের ধর্মীয় দিক পর্যালোচনা করে

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার একটি গ্রামে চিংড়িঘেরে শ্যাওলা ছাড়ানোর কাজ করছেন মুন্ডা

দেখা যায় এরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আচার-আচরণ এরা অনেকটাই মেনে চলেন। প্রথম দিকে এরা শিবের পূজারি তবে বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো বিভিন্ন পূজা-পার্বণ করে থাকেন।

মুন্ডা সম্প্রদায় কোনো এক সময় মাতৃতান্ত্রিক থাকলেও বর্তমানে পুরুষতান্ত্রিক। তাদের সমাজে মোড়ল ও রাজার অবস্থান রয়েছে। কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে মোড়লের কর্মকান্ড এবং এরূপ অনেকগুলো গোষ্ঠীর মধ্যে রাজার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। মোড়ল বা রাজা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

শারীরিক গঠন

মুন্ডাদের শারীরিক গঠনের সঙ্গে সাঁওতালদের শারীরিক গঠনের মিল রয়েছে। এরা কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট এবং নাতিদীর্ঘ দেহের অধিকারী। এরা খুবই পরিশ্রমী। তবে প্রজন্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের চেহারা ও শারীরিক গঠনেও পরিবর্তন আসছে। নতুন প্রজন্মের কিছু কিছু মুন্ডাকে বাঙালির মতোই মনে হয়।

মুন্ডাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা

মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকশত বছর। এই দীর্ঘদিনে মুন্ডাদের অনেক বিষয়ে অনেক অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে। যতদূর জানা যায়, মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ শিবের উপাসনা করে। তবে স্থানভেদে এই উপাসনা প্রক্রিয়ায় পার্থক্য রয়েছে। যেমন ভারতের মুন্ডারা যেভাবে তাদের আরাধ্য দেবতার উপাসনা করে আর বাংলাদেশে যারা এসেছে তাদের উপাসনা পদ্ধতি বর্তমানে এক নয়। বাংলাদেশের মুন্ডাদের উপাসনা বর্তমানে অনেকটাই বাঙালিদের মতো। তাদের নিজস্ব নৃত্য রয়েছে। এই নৃত্যের নাম

নূপুর নৃত্য। পায়ে নূপুর বেঁধে দলবেঁধে একসঙ্গে বাজনার তালে তারা নাচে। এই নাচকেই বলা হয় নূপুর নৃত্য। এই নূপুর নৃত্যের মধ্যে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

মুন্ডাদের বৈবাহিক পদ্ধতি

মুন্ডারা শুধু তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে থাকে। খুলনার কয়রা থানার মুন্ডারা অধিকাংশই সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার মুন্ডাদের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। অল্প বয়সে তারা বিয়ে করে থাকেন অনেকটা হিন্দু সম্প্রদায়ের অতীতের গৌরি বিবাহ প্রথার মতো। সাতপাঁকে তাদের বিয়ে হয়। বিয়েতে মন্ত্রও পড়ানো হয়। তবে মন্ত্র পড়ান নিজেরাই। বিয়ের ব্যাপারে তাদের সব দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন মোড়ল অথবা রাজা। আর বিয়ে পড়ান নির্ধারিত ব্যক্তিরা। বিয়ের অনুষ্ঠানে সাধারণত মেয়েদেরই প্রাধান্য থাকে। তারা বাঙালি হিন্দুদের মতো সম্প্রতি শাঁখা-সিঁদুর পরলেও আগে পরতেন না বলে তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়।

মুন্ডাদের অতীত ও বর্তমান পেশা

মুন্ডাদের মূল পেশা ছিলো সুন্দরবন কেটে আবাদি জমি তৈরি করা। মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে গভীর জঙ্গল কেটে এরা আবাদি জমি তৈরি করতো। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করে লবণ জলের হাত থেকে ফসলি জমি রক্ষা করার কাজ করতো। আবার কখনও কখনও বিভিন্ন রাজা ও জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে এদের কাজ করতে হতো। হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হলেও পারিশ্রমিক হিসেবে এদের তেমন কিছুই দেয়া হতো না। বন কেটে নতুন জমি তৈরি করার বিনিময়ে সামান্য জমি তাদের কৃষিকাজ করার জন্য দেয়া হতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেশাগত দিক দিয়েও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মুন্ডাদের পেশা হলো মাছ ধরা, মাটি কাটা এবং কৃষিকাজ করা। এ তিনটি কাজেই তারা খুব পারদর্শী।

এসব আদিবাসী জীবিকার জন্য সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের আরো অনেক কাজ করে থাকে। তারা নারী-পুরুষ সবাই দিনমজুরের কাজ করে থাকে। পরের জমিতে কৃষিকাজ করে। মাটি কাটার মতো কঠিন কাজ করে থাকে নারী-পুরুষ উভয়েই। সুন্দরবন সংলগ্ন নদ-নদী ও বাঁওড়ে মাছও ধরে একসঙ্গে। বর্শা দিয়ে জঙ্গলে পাখি শিকার করে। ঝোঁপ-ঝাড়ের মাটি খুঁড়ে কচ্ছপ শিকার করে। শামুক-ঝিনুক কুড়ায় অনেকে। আবার অনেকে পরের জমি বর্গাচাষ করে। তবে কোনো ক্ষেত্রেই তারা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না। অতি সম্প্রতি মুন্ডারা খুব অল্পসংখ্যক ভ্যানচালক, কাঠমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিক্যাল, ওয়েলডিং, মোটর ম্যাকানিক্যালসহ কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে কাজ করছে। তবে এদের সংখ্যা খুবই অল্প, হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র।

মুন্ডাদের খাদ্য খাবার

আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ এবং আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের খাবারের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এরা বনে জঙ্গলে শিকার খোঁজে। সাঁওতালদের মতো মুন্ডারাও ব্যাঙ, সাপ, ইঁদুর, বন্য প্রাণী-শামুক, ঝিনুক, কেঁচো খেয়ে থাকে। তবে বর্তমানে এগুলো তাদের খাদ্য তালিকা থেকে ক্রমান্বয়ে বাদ পড়ছে। এছাড়া নেশাজাতীয় খাবারের মধ্যে নিজেদের তৈরি তাড়ি (গাছের রস পচিয়ে তৈরি করা হয়) এবং হাঁড়িয়া (ভাত পচিয়ে করা হয়) পান করে থাকে। তাড়ি ও হাঁড়িয়া অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাদের কাছে এক আকর্ষণীয় খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়।

তবে কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাবারেও পরিবর্তন এসেছে। নিজেদের মধ্যে কিছুটা সংস্কার এবং পারিপার্শ্বিক চাপের মুখে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের খাদ্যাভ্যাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বিকল্প খাদ্য হিসেবে ওই সব খাবারের সঙ্গে মুন্ডারা বর্তমানে ভাত-মাছ খেয়ে থাকে। যা সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের খাবার। এমন খাবারেই তারা অভ্যস্ত হচ্ছে।

ভূমি ব্যবস্থা ও মুন্ডা সম্প্রদায়

মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকাংশই বর্তমানে ভূমিহীন। তাদের কারো কারো নিজস্ব কোনো জমি নেই। পরের জমিতে অথবা খাস জমিতে তাদের অনেকেরই বসবাস। তবে এক সময়ে তৎকালীন জমিদাররা তাদের দিয়ে সুন্দরবন কাটিয়ে আবাদি জমি তৈরি করে। এ সময়ে তাদের কিছু জমি বসবাস ও কৃষিকাজ করার জন্য দেয়া হয়। শর্ত থাকে ওই জমি শুধু তারা ভোগ দখল করতে পারবে, বিক্রি করতে পারবে না। এ কারণেই মুন্ডাদের জমি বিক্রি হতো না। তবে পরবর্তীতে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মুন্ডাদের সামান্য সম্পত্তির ওপর। তারা প্রতারণার মাধ্যমে মুন্ডাদের পদবি পরিবর্তন করে কুলি, সরদার করে ফেলে। হাতে সামান্য পয়সা ধরিয়ে দিয়ে লিখে নেয় তাদের সহায়-সম্পত্তি। ভূমিহীন হয়ে যায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ। কৃষিকাজ তো দূরের কথা, মাথা গোঁজার মতো একখন্ড জমিও কারো কারো থাকে না।

এদের মধ্যে বর্তমানে কারো কারো সামান্য জমি থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। তাদের জমি বাড়েনি, বেড়েছে পরিবারে মানুষের সংখ্যা। ফলে ভাগ হতে হতে সামান্য জমি তিল পরিমাণে এসে দাঁড়িয়েছে। এ জমিতেই গায়ে গায়ে ঘর বেঁধে তাদের অনেককেই বসবাস করতে হচ্ছে। আবার অনেকে ভাসমান। কোনো কোনো মুন্ডা পরের জমি বর্গাচাষ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে জমির মালিকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য বা পারিশ্রমিক দেয় না।

শিক্ষাবঞ্চিত মুন্ডারা

আদিকাল থেকেই এই আদিবাসী সম্প্রদায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন নিজেরা লেখাপড়ার ব্যাপারে কখনো এগিয়ে আসতে পারেনি, তেমনি সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে সরকার বা অন্য কেউও তাদের লেখাপড়ার বিষয়টি আমলে আনেনি। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও তাদের লেখাপড়া শেখার অন্তরায় রয়ে গেছে সারাক্ষণ, যার কারণে বরাবরই তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। তবে অতি সম্প্রতি মুন্ডাদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে কিছু বেসরকারি সংস্থা। মুন্ডাদের এলাকায় শুধু তাদের শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া না গেলেও কেউ কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। মাত্র হাতে গোনা ২/৩টি ছেলে এই অশিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে সামান্য লেখাপড়া শিখতে পেরেছে। মুন্ডাদের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, তবে বাংলাদেশের মুন্ডারা এই ভাষার কোনো হরপ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না। তারা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে, শুধু তখনই এই ভাষার প্রয়োগ করে থাকে। অন্য সময় তারা বাংলা ও তাদের নিজস্ব ভাষার সংমিশ্রণে কথা বলে থাকে।

মুন্ডাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই

মুন্ডাদের বাড়ি মাটির তৈরি। স্যাঁতসেঁতে নোংরা পরিবেশে তারা বসবাস করে। তাদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। বাসি-পচা খাবারে তারা অভ্যস্ত। স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন তাদের অভিধানে নেই। তারা অসংখ্য ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে থাকে। জন্মের পর থেকেই মুন্ডাদের সন্তানেরা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। অসুখ-বিসুখে তারা ওষুধের চেয়ে ঝাড়-ফুঁকের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য খাবার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারে সচেতন না থাকায় সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিয়েই তাদের জন্মের পর থেকে বেড়ে উঠতে হয়।

অন্তহীন সমস্যায় মুন্ডা সম্প্রদায়

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে অন্তহীন সমস্যা। অন্তহীন এই সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো অধিকাংশ মুন্ডাদের নিজস্ব জমি নেই। এদের অনেকেই পরের জমি বা খাস জমিতে বসবাস করে থাকে। তবে এক সময়ে এদের জমি ছিলো। তবে তা বিক্রি হতো না। তারপরও একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল নানান ছলচাতুরী করে তাদের জমি হাতিয়ে নেয়। নিজের জমি না থাকায় সামান্য লাভে অথবা ধানের জন্য তাদের অন্যের জমি বর্গাচাষ করতে হয়। মুন্ডারা মাছ ধরা, দিনমজুরির কাজ করা, মাটি কাটা ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু সমাজে তারা অবহেলিত, দলিত হওয়ায় অনেকেই তাদের কাজ দিতে চায় না। যে কাজ অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়, সেই কাজ সামান্য মজুরি দিয়ে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষকে দিয়ে করানো হয়। যার কারণে তারা পর্যাপ্ত কাজ পায় না। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এই মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ। সামাজিক বৈষম্যের কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের সহজে স্কুলে পাঠাতে পারে না বা প্রতিবেশীরা তা মেনেও নেয় না। মুন্ডাদের একটা বড় সমস্যা তারা স্বাস্থ্যসম্মত

শৌচাগার ব্যবহার করে না। রাস্তাঘাট এবং ফাঁকা মাঠে এরা যত্রতত্র মল ত্যাগ করে থাকে, যার ফলে রোগজীবাণু ছড়ায়। পানীয় জলের ব্যাপারে তারা মোটেই সচেতন নয়। মুন্ডাদের এলাকায় নলকূপ পর্যাপ্ত না থাকায় তারা পুকুর বা নদীর পানিও পান করে। স্বাস্থ্যসচেতনতা এদের একেবারে নেই। মানুষ হিসেবে সমাজে এদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। এ সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব সামাজিক, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ভুলতে বসেছে। প্রজন্ম যত পরিবর্তন হচ্ছে মুন্ডাদের স্বকীয়তা তত হারিয়ে যাচ্ছে এবং এ অঞ্চলে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে এরা তাল মিলিয়ে নিচ্ছে। দলিত, নিপীড়িত, অন্ত্যজ সম্প্রদায় হিসেবে এদের মনে করা হয়, যার কারণে কখনই এরা সমাজের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মিশতে পারেনি। তারা রয়ে গেছে সেই অন্ধকারেই। মুন্ডাদের আর একটি অন্যতম সমস্যা হলো ভারত-বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ভারতের মুন্ডা অধ্যুষিত এলাকায় চলে গেছে।

মুন্ডাদের অবস্থান ও সংখ্যা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনার কয়রা থানা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও তালা থানার কিছু কিছু এলাকায় মুন্ডারা বসবাস করছে। কয়রা থানায় মুন্ডা ও মাহাতো উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। কয়রার শুধু উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের হরিহরপুর গ্রামে মাহাতো সম্প্রদায় রয়েছে। কয়রা থানার প্রায় ১৫টি গ্রামে ১৫০০ থেকে ২০০০ মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে থাকে। আর সাতক্ষীরা জেলার তালা ও শ্যামনগর থানায় রয়েছে প্রায় ৩০০০ থেকে ৩৫০০ জন।

মুন্ডাদের নিয়ে কে কি ভাবছেন

মুন্ডাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। তবে ইতিলিয়ান ফারদার লুইজি প্যাগি গত প্রায় তিন বছর ধরে মুন্ডা সম্প্রদায়ের মাঝে কাজ করছেন। তাদের প্রাথমিক শিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ এবং ভাসমান মুন্ডাদের জন্য জমি কিনে তাদের পুনর্বাসিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সবচেয়ে যা বেশি প্রয়োজন তা হলো তাদের অধিকার সচেতন করে তুলে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো।

কেইস স্টাডি-১

উত্তর বেতকাশি ইউনিয়নের মাজেরপাড়া গ্রামে বাস করে মৃত ভাদর মুন্ডার ছেলে শরৎ মুন্ডা। বয়স ৮০ পেরিয়ে গেছে। শরীরের গঠন হালকা-পাতলা। দেখলে মনে হয় দেহে রোগবালাই কিছু নেই। কবে মুন্ডারা এ দেশে এসেছিলো তা শরৎ বলতে পারে না। তবে পূর্বপুরুষেরা রাচি থেকে এসেছে বলে সে জানায়। কোন জমিদার তাদের

সুন্দরবনের কোলঘেঁষে বসবাসকারী মুন্ডা সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ নিজস্ব সংস্কৃতিতে নৃত্য পরিবেশন

এনেছিলো তাও সে জানে না। বন কাটা আর বাঁধ দেয়াই ছিলো তার বাপ-দাদাদের কাজ, এটা সে ভালো করেই জানে। শরতের পরিবারে একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তবুও এই দু'জনের সংসার চালাতে শরৎকে হিমশিম খেতে হয়। খেয়ে না খেয়ে কাটাতে হয় তাদের। কারণ হিসেবে সে জানায়, তাদের নিজেদের জমি নেই। দিনমজুরের কাজ করতে হয়। সব দিন যেমন কাজ পাওয়া যায় না, তেমনি সবাই আবার তাদের কাজ দেয় না। বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তার। সে জানায়, তার বাপ-দাদারা বন কেটে জমিদারদের কাছ থেকে যে জমি পেয়েছিলো তা এককালে বাপ-দাদাদের কাছ থেকেই এ অঞ্চলের কিছু মানুষ ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে।

শরত তার পূর্বপুরুষের ভাষায় কথা বলে শোনায়, গান গায়। এই কথা বা গান একটু মন দিয়ে শুনলে বেশ ভালোই বোঝা যায়। শরৎ জানায়, তারা নিজেরাই বিয়ের মন্ত্র পড়ে তবে সাতপাঁক দিয়েই বিয়ে হয়। জ্বালানির অভাবে মৃত ব্যক্তির সৎকার করা হয় মাটিতে সমাহিত করে। শরতের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়, ৮০ বছর বয়সের এই ব্যক্তিটির বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা নেই।

কেইস স্টাডি-২

২ নং কয়রা ইউনিয়নের নলপাড়া গ্রামে প্রায় ৩০টি মুন্ডা পরিবার বসবাস করে। তাদেরই একজনের নাম রবীন মুন্ডা। সমীর মুন্ডার ছেলে এই রবীন। মাত্র দেড় শতক জমি আছে তাদের। এই জমির ওপর ছোট্ট একটি ঘর। এই ঘরেই রবীন মুন্ডার ৭৫ বছর বয়স্ক বাবাসহ ৬ সদস্যের বসবাস। রবীনের বাবা সমীর মুন্ডা জানান, তাদের জমি ওই এলাকার লোকেরা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে। আগে বুঝতে পারেনি। তিনি জানান, তাদের জমি বিক্রি হতো না। তাই এলাকার চতুর মানুষেরা তাদের মুন্ডা পদবি পাল্টে দিয়ে সরদার, কুলি, বুনো নামে ডাকতে শুরু করে। তাদের হাতে সামান্য টাকা দিয়ে জমি জালিয়াতি করে নেয়। বয়স্ক এই মুন্ডা জানান, তাদের সমাজে মোড়ল আছে, আছে একজন রাজা। মোড়ল বা রাজারা তাদের মতোই। সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে দিকনির্দেশনা দেয়াই হলো তাদের কাজ।

সমীর আরো জানান, অবহেলা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ছাড়া তাদের কপালে আর কিছু নেই। অথচ আমরা যদি বন না কাটতাম তাহলে এই সাহেবদের এত ফুটানি আসতো না। তাদের মানুষ ভাবতে অন্য সমাজের মানুষ চায় না। সবাই যেন ঘৃণার চোখে দেখে। বুনো বলে, কুলি বলে। তিনি দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার চান। আদিবাসী হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার চান।

কেইস স্টাডি-৩

১ নং কয়রা ইউনিয়নের মাজের হাটি গ্রামের আর একটি মুন্ডা পরিবার হলো অনিল মুন্ডার পরিবার। অনিলের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি। স্ত্রী পিয়ারী মুন্ডার বয়স ৪৫ হবে। অনিলকে দেখলেই মনে হয় অভাব ওকে গ্রাস করে রেখেছে। তার চোখেমুখে, কথাবার্তায় অন্তত তাই প্রমাণিত হয়। অনিলের বাবা পঞ্চারাম মুন্ডা বেঁচে নেই, নেই তার মাও। স্ত্রী, আর ৫ সন্তান নিয়ে অনিলের সংসার চলে না। সংসারে সে একাই দিনমজুরের কাজ করে। যা আয় হয় তাতে সংসার মোটেই চলে না। তাই বাধ্য হয়ে পিয়ারীকেও কাজ করতে হয়। পিয়ারী নদীতে মাছ ধরে, কাঁকড়া ধরে আর বাজারে বিক্রি করে।

অনিল মুন্ডার শোয়ার ঘরে ছাউনি নেই। নাড়া দিয়ে ঘরের চাল দেয়া হলেও সামান্য নাড়া কেনার পয়সা তার নেই। তাই এই বর্ষাকালে তাকে সামান্য বৃষ্টি হলেই ভিজে যেতে হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় কারণ তার বাড়ির ওপরই হচ্ছে একটি স্যাটেলাইট স্কুল। শুধু মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষের সন্তানেরাই এ স্কুলে পড়ে।

অনিল মুন্ডা এই এলাকার মুন্ডাদের রাজা হিসেবে পরিচিত এবং সে নিজেও সেই দাবি করে। রাজা হিসেবে একমাত্র সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এর বাইরে তার সমাজের মানুষকে কোনো বাড়তি সুযোগ যেমন দিতে পারে না, তেমনি কোনো বাড়তি সুযোগ নিতেও পারে না।